১২ মহামানব

শ্রীগদাধর পিকচার্স লিঃর নিবেদন

শ্রীগদাধর পিকচার্স লিঃ'র
প্রথম নিবেদন

হে মহামানব

পরিচালনা : **গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়**

প্রযোজনা : **নীরোদ গোস্বামী**

কাহিনী ও চিত্রনাট্য : জীবানন্দ ঘোষ। প্রধান কর্মসচিব : বলাই ঘোষ। চিত্রশিল্পী : প্রবোধ দাস। শব্দযন্ত্রী : নৃপেন পাল ও সত্যেন চট্টোপাধ্যায়। সম্পাদনা : বীরেন গুহ। দৃশ্যপরিকল্পনা : কার্তিক বসু। সুরসৃষ্টি : চিন্ময় লাহিড়ী। ব্যবস্থাপনা : ইন্দু মুখোপাধ্যায়। আবহসঙ্গীত : হিমাংশু বিশ্বাস ও সম্প্রদায়।

: সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনায় : জীবানন্দ ঘোষ, শান্তি দে ও গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়। চিত্রগ্রহণে : কৃষ্ণ ধর। সম্পাদনায় : অরবিন্দ ভট্টাচার্য্য, নীলু রায় ও শঙ্কর গুহ। শব্দগ্রহণে : শশাঙ্ক বসু। সুরসৃষ্টিতে : বলাই ঘোষ। দৃশ্য-পরিকল্পনায় : শচীন মুখার্জি। ব্যবস্থাপনায় : নীলু চৌধুরী। আলোক সম্পাতে : গোপাল কুণ্ডু, জগন্নাথ ঘোষ ও প্রভাস ভট্টাচার্য্য। স্থির-চিত্রে : কৃষ্ণচন্দ্র পাইন। নেপথ্য-কণ্ঠসঙ্গীতে : ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, শ্যামল মিত্র, বলাই ঘোষ ও প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়।

: ভূমিকায় :

প্রভাত দোষাল, অমরেশকুমার, অহীন্দ্র চৌধুরী, জহর গাঙ্গুলী, অজিত ধীরাজ, মোহন ঘোষাল, মিহির, শৈলেন গঙ্গোপাধ্যায়, জীবানন্দ ঘোষ প্রীতি মজুমদার, শ্যামলাহা, রাধারমন পাল, বেচু সিংহ, কমলাক্ষ বন্দ্যোঃ নিত্যানন্দ বসু, বলাই ঘোষ, মাঃ তড়িৎ, নীলু চৌধুরী, নরেন বসু, নারায়ণ মণ্ডল, ডাঃ হরেন মুখার্জি, সুনন্দা দেবী, ছায়া দেবী, রেবা দেবী, স্বাগতা চক্রবর্তী, শ্যামল চক্রবর্তী, কৃষ্ণা মুখার্জি, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, বাণীবাবু, ভুলুবাবু, সতু মুখার্জি, পূর্ণেন্দু মিত্র, ধীরেশ মজুমদার, বিশ্বনাথ দত্ত, নন্দ ঘোষ, ইন্দু মুখার্জি, প্রভৃতি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : দক্ষিণেশ্বর দেবোত্তর এষ্টেট্।
বিষ্ণু ঘোষের ব্যায়ামাগার। কসবা আদর্শ সমাজ।

প্রচার পরিচালনা : অনুশীলন এজেন্সী লিঃ।

রাধা ফিল্মস্ ষ্টুডিও এবং টেক্‌নিশিয়ান ষ্টুডিওতে গৃহীত।
বেঙ্গল ফিল্ম লেবরেটারীজ লিঃ হইতে পরিস্ফুটিত।

একমাত্র পরিবেশক : **নারায়ণ পিকচার্স লিঃ**

26. 3. 56. Sunday

কাহিনী

ফুল আছে—সুবাস নেই ; দীপ আছে—শিখা নেই ; সূর্য আছে—তেজ নেই..... দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর আকুল আগ্রহে খুঁজে বেড়ান সেই সুবাস, সেই শিখা, সেই তেজ.....মন্দিরে ৺মা'র কাছে কাতরভাবে জানান তিনি : "মা ! একে-একে সবাই তো এলো, কই, সে তো এখনো এলোনা..... !" গঙ্গার ধারে ডুবু ডুবু সূর্যের দিকে চেয়ে তাই ঠাকুর কাঁদেন শিশুর মত ; বলেন : "ওইতো, আরো একটা দিন চলে' গেল, কই আজো তো সে এলোনা ! তাকে এনে দে মা, এনে দে—"

ঠাকুরের অন্যতম ভক্ত কোলকাতা'র সুরেন্দ্র মিত্রের আমন্ত্রণে ঠাকুর এলেন কোলকাতায় তাঁর বাড়ীতে। কত বড় বাড়ী, কত লোকজন, ৺মায়ের নাম গান, দুপ-ধুনো ফুল কিন্তু সে কই ? অকস্মাৎ ঠাকুর চঞ্চল হয়ে ওঠেন। মনের মাঝে বেজে ওঠে শত জলতরঙ্গের সহস্র টুং-টাং শব্দ...সানন্দে বলে' ওঠেন : "ও সুরেন, দ্যাখ্, দ্যাখ্, এই মাত্তর কে যেন এসেছে তোদের বাড়ীতে...যা, যা, দ্যাখ্—"

কিন্তু যেতেও হয় না, বুকের ওপড় আড়াআড়ি হাত রেখে অদূরে এসে দাঁড়ায় সেই প্রাণধন—শ্রীনরেন্দ্র নাথ দত্ত। ঠাকুর আত্মহারা হয়ে বলে' ওঠেন : "ওরে, এলি ? এ্যাদ্দিন বাদে মনে পড়লো তোর ? আয়—বুকে আয়—"

সিমলের বিখ্যাত এ্যাটর্নী বিশ্বনাথ দত্তের ছেলে নরেন্দ্রনাথ দত্ত কোনরকমেই পছন্দ করেনা ধর্মের ভাব নিয়ে এইসব ভাববিলাসের অলস লীলাখেলা। সুরেনবাবুর বিশেষ অনুরোধে সে এসেছিল একখানি গান গাইতে, গাইলো প্রাণচঞ্চল হয়ে, চলে' গেল ঠাকুরের প্রাণকে চঞ্চল করে'।

তাইতো ! একি হলো ! দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এসেও ঠাকুরের স্বস্তি নেই। দিন-রাত্রি খোঁজেন তাকে। প্রতীক্ষা করে' পথ চেয়ে বসে থাকেন তা'র।

এদিকে কঠোর বাস্তববাদী নরেন্দ্র দত্ত চঞ্চল হয়ে পড়ে। পচা সনাতনী ধর্মের জোয়ারে গা ভাসিয়ে যাঁরা দেশের লোককে পঙ্গু আর অকর্মন্য করবার চেষ্টা করছেন—নরেন তাঁদের বিপক্ষে একটা কিছু করবার মনস্থ করতে গিয়ে একদিন নিজেরই অজ্ঞাতে এসে পড়লো দক্ষিণেশ্বরে।

নরেনকে দেখে ঠাকুর আত্মহারা। শিশুর মত নৃত্য করতে থাকেন তিনি। নরেন্দ্রকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে সন্দেশ খাওয়ান, বুকে জড়িয়ে ধরেন। নরেন্দ্র বলে : "ওসব থাক্। আগে আমাকে বলুন—আপনি ঈশ্বরকে দেখেছেন ? ঠাকুর তৎক্ষণাৎ জবাব দেন : "হ্যাঁ। এই যেমন তোকে দেখছি, তেমনি তাঁকেও দেখি"।

বিস্মিত নরেন্দ্র বলে: "আমাকে দেখাতে পারেন?" ঠাকুর সহাস্যে জবাব দেন: "হ্যাঁ।...কিন্তু উতলা হচ্ছিস কেন? সবুরে মেওয়া ফলাবো যে—"

নরেনের মাথা ঘুরে যায়। লোকটা বলে কি! খেতে-শুতে-বস্‌তে, কলেজের পড়ায়, বন্ধুদের আড্ডায় কোথাও সে স্থির হ'তে পারে না। আবার সে চলে দক্ষিণেশ্বরে। মনের মধ্যে সেই প্রশ্ন: ভগবানকে মানুষ দেখতে পায়...? ঠাকুর বসেছিলেন সেদিন একলা নিজের ঘরে। অন্তর্যামী ঠাকুর হৃদয়ঙ্গম করলেন নরেন্দ্রর হৃদয়ের ভাষা। তাই আসা মাত্র তার আশা পূরণ করতেই যেন নরেন্দ্রের দেহে একটি পা ছুঁইয়ে দিলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে ঘটে গেল এক অভিনব ব্যাপার। পরিপূর্ণরূপে তা অনুভব করলো নরেন্দ্র আর ঠাকুর। আমরা দেখলাম শুধু—নরেন্দ্রর চোখের সাম্‌নে পৃথিবীখানা ঘুরছে।

হঠাৎ নরেনের বাবা ইহলোক ত্যাগ করলেন। সমস্ত সংসার পড়লো নরেনের ঘাড়ে। আর সেই সঙ্গে একরাশ ঋণও। মা-ভাই-সংসার—এদের বাঁচিয়ে রাখতে দ্বারে দ্বারে ঘুরতে থাকলো একটি তুচ্ছ চাকরীর আশায়। কিন্তু কিছুই হয়না। চোখের ওপর মা-ভাইয়ের দিন কাটে অনাহারে অর্ধাহারে। ঠিক সেই সময়ে ঠাকুর এলেন কোলকাতায় বলরাম বসুর বাড়ীতে। নরেন গেল সেখানে। ঠাকুর তাকে ধরে' নিয়ে এলেন দক্ষিণেশ্বরে। আর তারপর নিভৃতে বললেন: "যা তুই বলবি, আমি তা জানি। কিন্তু একটা কথা—আমি যদ্দিন আছি, অন্ততঃ তদ্দিন আমার জন্যে তুই থাক। ওরে নরেন, তুই আমি আলাদা নয়। এবার আমি শুধু এসেছি তোরই জন্যে.....!"

জ্ঞান চক্ষু খুলে যায় নরেন্দ্রের। লুটিয়ে পড়ে ঠাকুরের পায়। কিন্তু বাড়ীতে ফিরতেই আবার সেই দৃশ্য: দৈন্যের বিরাট মুখব্যাদন.....। বিভ্রান্ত নরেন্দ্র ছুট্‌তে ছুট্‌তে সেই রাত্রেই এসে হাজির হয় দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর প্রশ্ন করেন: "একীরে! রেতের বেলায় আবার ফিরে এলি যে ঘড়?" নরেন আকুলভাবে বলে ওঠে: "বাড়ীতে মা ভাইয়ের অবস্থা আর আমি চোখে দেখতে পাচ্ছিনা। আপনি যা হয় একটা করুন।" ঠাকুর বলেন: "ওরে, আমি কি করবোরে? তোর যদি কিছু বল্‌বার থাকে, গিয়ে বলগে যা ওই মন্দিরে।" নরেন বলে: "কিন্তু আমি তো আপনার মাকে মানিনা।" একরকম জোর করে ঠেলে পাঠিয়ে দেন ঠাকুর নরেনকে। নরেন্দ্র মন্দিরে এস ঠাকুরের নির্দ্দেশে ভবতারিণীকে 'মা' বলে ডেকে যেই বল্‌তে গেল তার দৈন্যের কথা, অমনি ৺মা উঠলেন ঝল্‌মলিয়ে। নরেন সবিস্ময়ে দেখ্‌লো—৺মা মৃন্ময়ী নন, জীবন্ত। সে আনন্দে আকুলভাবে শুধু ডাক্‌তে থাক্‌লো 'মা-মা' করে। তারপর বিজয়ীর আনন্দে ছুটে এলো ঠাকুরের কাছে, ঠাকুর বল্‌লেন: "কীরে? যার কাছে বলেছিস্ তো তোর দৈন্যের কথা?" নরেন্দ্রের হর্ষ বিষাদে রূপান্তরিত হয়—তাই তো আসল কথাই তো তার বলা হয়নি। ঠাকুর বল্‌লেন: "যা, যা, ফের যা! বলগে যা তোর অভাবের কথা।" নরেন্দ্র আবার যায়। মন শক্ত করে ৺মার সাম্‌নে বল্‌তে যায় তার অভাবের কথা। কিন্তু বলে ফেলে: "আমায় জ্ঞান দাও মা, ভক্তি দাও, বিবেক দাও—!" পিছন থেকে স্পর্শ করেন তাকে ঠাকুর। বলেন: "দুস্ ছোড়া! তোর কপালে সংসার সুখ নেই দেখছি। বাড়ীতে তারা সবাই তোর পথ চেয়ে বসে রয়েছে, আর তুই এদিকে—" নরেন্দ্র তৎক্ষণাৎ বলে: "সে আমি জানিনা, আপনি জানেন। আমি জানি শুধু—" বলেই লুটিয়ে পড়ে ঠাকুরের পায়ে। বুকে তুলে নিতে-নিতে ঠাকুর তখন বলেন: যা, আজ থেকে তোর মা-ভাইয়ের মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের আর অভাব হবে না।" নরেন্দ্র আত্মহারা হয়ে বলে ওঠে। 'বলে ওঠে': "আমাকে বলে দিন তা'হলে—৺মাকে আমি কী বলে ডাক্‌বো?" ঠাকুর বলেন: "বল্ ত্বং হি তারা—।" নরেন্দ্র আবেগময় কণ্ঠে বলে' ওঠে: "মা, ত্বং হি তারা!" বল্‌তে বল্‌তে আনন্দে বিভোর হয়ে সে ছুটে আসে পঞ্চবটীতে। সারা পঞ্চবটি, ভরে ওঠে, নরেন্দ্রের "ত্বং হি তারা" নামে। ঠাকুরও থাক্‌তে পারেন না, উপছে পড়া আনন্দে তিনি আনন্দময় হয়ে এসে দাঁড়ান নরেন্দ্রের পিছনে। নরেন্দ্র নিজেকে নিঃশেস করে দেয় ঠাকুরের শ্রীচরণে। ঠাকুরের তখন পূর্ণসমাধি আর নরেন্দ্রের কণ্ঠে—ঠাকুরের স্তোত্র।

সঙ্গীতাংশ

—সমবেত সঙ্গীত—

মা জাগো, মা জাগো
জাগো, জাগো, জাগো
জাগো, জাগো, জাগো কুল কুণ্ডলিনী
আদি শকতি পরাবিদ্যা নারায়ণী
ব্রহ্ম সনাতনী বাগবাদিনী
ত্রিভুবন মোহিনী, ত্রিজগৎ জননী
কোটি বিজলী প্রভা-জীবগতি দায়িনী
আঁধার-পথে ত্রিকোণ-পীঠে স্বয়ম্ভু
হরবেষ্টিনী ॥
ষড়চক্রভেদিনী সহস্রার-গামিনী
শিব-সঙ্গ বিলাসিনী জয় জয় যোগিনী
অকূল সাধক তুমি কূল দায়িনী
পরমকলা কুলিনা কুল কামিনী।

—নরেনের গান—

মন চল নিজ নিকেতনে
সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে
ভ্রম কেন অকারণে।
বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ
সব তোর পর, কেহ নয় আপন
পর প্রেমে কেন হ'য়ে অচেতন
ভুলিছ আপন জনে।
সত্যপথে মন কর আরোহণ
প্রেমের আলো জ্বালি চলো অণুক্ষণ
সঙ্গেতে সম্বল রাখো পুণ্যধন
গোপনে অতি যতনে।

—নিমাইয়ের গান—

পঞ্চবটির হে মহা সাধক
তোমায় নমস্কার
তীর্থ হোল এদেশ মোদের
পরশে চরণ তোমার।
তোমার তুলনা তুমিই দেবতা
এনেছি অঞ্জলি চরণে দেবতা
কোথা তুমি ওগো নর-নারায়ণ
ডাকি যে বারে বার ॥
যুগে যুগে আসো রূপে রূপে তুমি
তুমিই ভগবান
তোমার পূজায়, তোমার ধ্যানে
শেষ হোক মোর প্রাণ।
তুমি সেই বুদ্ধ তুমি শ্রীচৈতন্য
তোমারে পাইয়া হলেম ধন্য
নবরূপে তুমি এসো হে নাথ
ঘুচাও অন্ধকার ॥

(—জীবানন্দ ঘোষ)

—নরেনের গান—

এবার আমি ভাল ভাব পেয়েছি
ভালো ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি।
যে দেশে রজনী নাই মা
সেই দেশের এক লোক পেয়েছি।
আমি কিবা দিবা, কিবা সন্ধ্যা
সন্ধ্যারে বন্ধ্যা করেছি।
নূপুরে মিশায়ে তাল
সেই তালের একগীত শিখেছি
তাদ্রিম তাদ্রিম বাজছে সে তাল
নিমিষে ওস্তাদ করেছি।
ঘুম ভেঙ্গেছে আর কি ঘুমাই
যোগে যাগে জেগে আছি
যোগনিদ্রা তোরে দিয়ে মা
ঘুমের ঘুম পাড়ায়েছি।

—নিমাইয়ের গান—

এ সব ক্ষ্যাপা মেয়ের খেলা
সে যে আপনি ক্ষ্যাপা কর্ত্তা ক্ষ্যাপা
ক্ষ্যাপা দুটো চেলা।
কি রূপ কি গুণভঙ্গী
কি ভাব কিছুই যায় না বলা।
যার নাম জপিয়ে কপাল পোড়ে
কণ্ঠে বিষের জ্বালা।
সগুণে নির্গুণে বাধিয়ে বিবাদ
ঢেলা দিয়ে ভাঙ্গছে ঢেলা
সে যে সকল বিষয় সমান রাজী
নারাজ কাজের বেলা।
প্রসাদ বলে থাকো বসে
ভবার্ণবে ভাসিয়ে ভেলা
যখন আসবে জোয়ার উজিয়ে যাবে
ভাঁটিয়ে ভাটার বেলা।

—কুমারীর গান—

তোর যাওয়ার পথ যে বেঁধে দিলাম
রক্ত জবার ভারে
লুকিয়ে আসা, লুকিয়ে যাওয়া
চলবে নারে।
হারিয়ে পুতুল কাঁদিস কেন
তুই মায়ের কোলে শিশু যেন
ও যে শক্ত ছেলে পাথর গড়া
ডুবলে তবু টলবে নারে ॥
প্রাণের প্রিয় পরম ধনে
খুঁজিস কেন হয়ে পাগল।
সে যে নিজেই যা'চে দিতে ধরা
কোথায় রে তোর তেমন আগল ॥
সব কিছু তুই রেখে এবার
আয়রে নিতে সঙ্গটি তার
তোর পরশে উঠুক ফুটে
তার চিত্ত-পদ্ম থরে থরে।

(—জীবানন্দ ঘোষ)

—নরেনের গান—

এসো মা, এসো মা ও হৃদয় রমা
পরাণ পুতুলী গো—
হৃদয় আসনে হও মা আসীন
নিরখি তোমারে গো!
আমার মা ত্বং হি তারা
তুমি ত্রিগুণ ধরা পরাৎপরা
আমি জানি মা ও দীনদয়াময়ী
তুমি দুর্গমেতে দুঃখহরা ॥
তুমি জলে, তুমি স্থলে মা-মাগো
তুমি আদ্যমূলে গো
আছ সর্বঘটে অর্ঘ্যপুটে
সাকার আকার নিরাকারা ॥
তুমি সন্ধ্যা, তুমি গায়ত্রী মা-মাগো
তুমি জগদ্ধাত্রী গো মা
তুমি অকূলের ত্রাণকর্ত্তী
সদা শিবের মনহরা ॥

নারায়ণ পিকচার্স লিঃ-র পরিবেশনায়

ছায়াসঙ্গিনী

শ্রেষ্ঠাংশে : মঞ্জু দে, অনুভা গুপ্তা, বসন্ত, ছবি, সুপ্রভা, বাবুয়া জহর গাঙ্গুলী। আলোকচিত্র ও পরিচালনা : বিভূতি ঘোষ।

শ্রীশ্রীমা

নাম ভূমিকায় : অনুভা গুপ্তা। ঠাকুরের ভূমিকায় : গুরুদাস। পরিচালনা : কালিপ্রসাদ ঘোষ। সুর : অনিল বাগচী।

মর্ত্যের মৃত্তিকা

উত্তমকুমার এবং সুচিত্রা সেনের অনুপম অভিনয়-নৈপুণ্যে ভাস্বর। পরিচালনা : সুধীর মুখার্জী। সুরসৃষ্টি : হেমন্ত মুখার্জী।

মামলার ফল

কাহিনী : শরৎচন্দ্র। পরিচালনা : পশুপতি চ্যাটার্জী। সুরসৃষ্টি : রবীন চ্যাটার্জী। চিত্রনাট্য : শৈলজানন্দ মুখার্জী।

শিল্পী

প্রধান দুটি চরিত্রে : সুচিত্রা সেন ও উত্তম কুমার। পরিচালনা : অগ্রগামী। সুর : রবীন চ্যাটার্জী।

সাবধান

শ্রেষ্ঠাংশে : সাবিত্রী, সবিতা, মঞ্জু, সত্য, মলিনা, ভানু।

আগামী কয়েকটি অবিস্মরণীয় অবদান

নারায়ণ পিকচার্স লিমিটেড, ৬৩নং ধর্মতলা ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত ও
অনুশীলন প্রেস, ৫২নং ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।